স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা।

কলিকাতা

৮০।১ নং, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট

আর্য্যমিশন্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ হইতে

প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY SASI BHUSHAN BHATTACHARYYA,

METCALFE PRESS:

56, AMHERST STREET.

1893.

বিজ্ঞাপন।

হায়, আজ ভারতের কি দুর্দিন! নরনারী সকলেই আত্ম-হারা হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখভোগ-লালসায় পরিভ্রাম্যমাণ। কালবশে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আত্মভাব তিরোহিত হওয়ায়, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া অনিত্য সুখের জন্য লালায়িত। সেই অলীক ও কল্পিত সুখের জন্য আজকাল অনেককেই স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা দিবার জন্য ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হায়, পূর্ব্বে ভারতরমণীরা যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায়? প্রকৃত স্বাধীনতার অভাবে দেশ ব্যভিচারে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই জন্যই কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে "স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। কিরূপ স্বাধীনতা ও শিক্ষা দিলে দেশের বালকবালিকাগণের যথার্থ উপকার হইতে পারে, ইহাতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। গুরুকৃপায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির দ্বারা যদি একজন পাঠক বা পাঠিকারও হিতসাধন হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার আপনাকে সার্থকজীবন মনে করিবেন! অলমতি বিস্তরেণ।

আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন
৮০।১ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৩১ বৈশাখ ১৩০০ } প্রকাশকস্য

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ—

স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা।

হিন্দুসন্তানমাত্রেই স্ত্রীজাতির সম্মান করিয়া থাকেন, এমন কি এখনও কুমারীপূজা ও সধবাপূজা অনেক স্থলেই প্রচলিত দেখা যায়। শাস্ত্রেও পত্নীব্যতীত অপর স্ত্রী মাত্রকেই জননীর ন্যায় জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, আনুষ্ঠানিক হিন্দু সাধকগণ শাস্ত্রের ঐ মহাবাক্য পালন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহা হিন্দুর গৌরবের বা পরিচয় দিবার কথা নহে, ইহা হিন্দু সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু উপস্থিত কালে সব বিপরীত, পুত্রের জননীর প্রতি ভক্তি নাই, জননীরও পুত্রের প্রতি তাদৃশ স্নেহ নাই। এমন অবস্থায় স্ত্রীজাতিমাত্রকেই জননী জ্ঞানকরা নিতান্ত অসম্ভব। যাঁহা হইতে আমরা এই শরীর লাভ করিয়াছি, যাঁহার দ্বারা এই জগৎ দেখিয়াছি, তাঁহাকেই যখন ভক্তি করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তখন স্ত্রীজাতি মাত্রকেই জননী জ্ঞান করা কিরূপে সম্ভবে? এমত অবস্থায় স্ত্রীস্বাধীনতা চলিতে পারে কিনা, তাহাই আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিল কিনা।

অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীস্বাধীনতা যে একেবারে প্রচলিত ছিল না একথা, বলিতে পারা যায় না, কারণ অনেক স্থলে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা ছিল বলিয়া দেখা যায়; কেবল বর্ত্তমান কালেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমত স্থলে স্বতই আমাদের মনে হইতে পারে যে, তবে কেন এখন আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্ন না করি। বস্তুতঃ ইহা মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। আমি স্ত্রী-জাতিকে যে স্বাধীনতা ও শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি, অগ্রে আমার কি তাহা লাভ করা উচিত নয়? "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ।" আমি যখন নিজেই অসিদ্ধ তখন কিরূপে অপরকে উপদেশ দিতে পারি? অগ্রে আমার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে আমি উহা লাভ করিতে পারি, নচেৎ স্ত্রীস্বাধীনতায় বা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যভিচারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে হইলে, অগ্রে নিজে স্বাধীন ও সংযমী হওয়া চাই, নতুবা বাতুলতা মাত্র। দুই জন অন্ধে কখনও পথ চলিতে পারে না, বরং এক জন অন্ধ ও একজন খঞ্জ হইলেও কাজ চলিতে পারে। যখন দুই জন অন্ধে বাহির হইয়াছি, তখন উভয়েরই পতন ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে? আমি নিজে দাঁড়কাক হইয়া ময়ূর পুচ্ছ দেখিয়া দুঃখিত হইলে চলিবে কেন? আমাদের স্বাধীন শব্দের অর্থ বোধ নাই বলিলেও চলে। স্বাধীন শব্দের অর্থ কি "Freely বেড়ান"? "Freely বেড়ানই" যদি স্বাধীনতা হয় তাহা হইলে পশু পক্ষীরাও ত স্বাধীন। বস্তুতঃ যদি স্বাধীনতার এইরূপ

অর্থই করা যায়, তাহা হইলে পশুপক্ষীতে আর আমাতে প্রভেদ কি ? পশুপক্ষীদেরও ক্ষুধা বোধ হইলে আহার করিয়া থাকে, কেহ তাড়া দিলে ভয়ে পলাইয়া থাকে, নিদ্রাও গিয়া থাকে, কামের উদ্ভব হইলে ইন্দ্রিয়চরিতার্থও করিয়া থাকে। এমন স্থলে পশুতে ও আমাতে কিছুই প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল মাত্র আকারে। আমি না হয় দ্বিপদ পশু, আর সে না হয় চতুষ্পদ, এই মাত্র। যদি ঐ সকল গুণ ছাড়া আমার অপর কোন গুণ থাকে, তাহা হইলেই আমি মনুষ্যপদ বাচ্য; নতুবা আমিও ঐরূপ পশু। সেই অপর গুণ কি যাহা পশুদিগের নাই এবং হইতেও পারে না ? তাহা একমাত্র আত্মজ্ঞান। সেই আত্মজ্ঞানই পশুজীবনে সম্ভবে না এবং উহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যতদিন আমরা উহা লাভ করিতে না পারি, ততদিন আমরা মনুষ্যপদ বাচ্য হইতে পারি না। তবে কেবল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জোর করিয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া থাকি। যখন আমার আত্মজ্ঞান লাভ হইবে, তখনই আমার স্বাধীন শব্দের যথার্থ অর্থ বোধ হইবে। নতুবা আমি ইন্দ্রিয়ের দাস। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে স্বাধীনতা লাভ করিব ? ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য স্বেচ্ছাচারিতামাত্র,—স্বাধীনতার ভাণ মাত্র। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অগ্রে যাহাতে ইন্দ্রিয়সংযম হয় তাহার উপায় করা উচিত, নচেৎ একেবারেই স্ত্রীস্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন ? যে পথে ব্যভিচারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সে পথে আমাদিগের জননীরূপা সরলহৃদয়া স্ত্রীজাতিকে

কিরূপে যাইতে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে? বরং তাঁহারা যাহাতে কণ্টকাকীর্ণ পথে না যান, তাহার উপায় করা উচিত। আর যদি নিতান্তই তাঁহারা সেই কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাহা সন্তানের কর্ত্তব্য তাহা করা উচিত—মাতা যে পথে চলিতেছেন, সেই পথ পরিষ্কার করা অর্থাৎ সেই পথে যে সকল কণ্টক আছে তৎ-সমুদয় উৎসারণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা। কারণ, তাঁহার চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে তিনি আর চলিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার পতন হইবে। তাঁহার পতন হইলে সন্তানও আর জননীর নিকট হইতে সদুপদেশ পাইবে না। সুতরাং একের পতনে উভয়েরই পতন সম্ভাবনা। কারণ তখন আর কে সদুপদেশ দিয়া আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবে? জননীর পতনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বত্রই ব্যভিচারে পূর্ণ হইবে। জননীর প্রতি সন্তানের অভক্তি হইবে, সন্তানের প্রতি জননীর আর স্নেহ থাকিবে না। স্ত্রীর প্রতি পতির প্রণয় যাইবে, স্ত্রীরও পতির প্রতি প্রণয়ভক্তির হ্রাস হইবে। সংসা-রের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য দূর হইয়া উভয়েরই কষ্টের কারণ হইবে। এমত স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্ত্রীস্বাধীনতা যাহাতে সমূলে উৎপাটিত হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করা উচিত এবং যাহাতে আমাদের জননীরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টাও প্রাণপণে করা চাই। কারণ, জননী যদি স্বাধীনতারূপ রত্ন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সন্তা-নেরও তাহাতে অধিকার আছে। কেন না, কোন ভাল বস্তু পাইলে সন্তানকে না দিয়া জননীরা নিজে তাহা গ্রহণ

করেন না। ইহা হিন্দু-জননীদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহার আর পরিচয় দিতে হইবে না। উপস্থিত কালেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্ত্রীস্বাধীনতা যদি আমাদের গৃহে গৃহে বিরাজ করে তাহা হইলে আর উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এমন সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে। কে আর তখন সংসার দেখিবে। আমাদের গৃহলক্ষ্মী জননী যখন অবিদ্যাভাবাপন্ন, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তখন আর কে আমাদের গৃহ সুসজ্জিত করিয়া আমাদের গৃহ আলোকিত করিবে। কেই বা ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল দিবে। সুতরাং ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ যাইবে। অতএব জননীর চলিবার পথের অজ্ঞানরূপ কণ্টক উৎসারণ করিয়া জ্ঞানরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা যাহাতে লাভ হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত—বিলম্ব করা উচিত নয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রকৃত স্বাধীনতা কি এবং স্বাধীনতা শব্দের অর্থই বা কি? স্বাধীন এই শব্দটীতে দুইটী পদ আছে—স্ব+অধীন=স্বাধীন। স্ব শব্দের অর্থ আত্মা বা আপনি আর অধীন শব্দের অর্থ বশীভূত, অতএব স্বাধীন=আপনার বশীভূত। অতএব স্বাধীন শব্দের প্রকৃত অর্থ আপনার বা আত্মার বশীভূত। এক্ষণে দেখা যাউক আমি বা আপনি কে। এই হাড়মাস বিশিষ্ট শরীর কি আপনি বা আমি। যদি বলি তাই বটে, তাহা হইলে আমার নিতান্ত ভ্রম; কেননা একটা শব দেহেওত হাড়মাস থাকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ও থাকে; কিন্তু সে শরীরে আপনি বা আমি নাই। আমার আমিত্বের অভাবে আমার হাড়মাস বিশিষ্ট শরীর পড়িয়া রহিয়াছে—সকল অঙ্গ

অবশ হইয়া গিয়াছে। এক আত্মশক্তির অভাবে কেহই কোন কার্য্য করিতেছে না। সেই আত্মশক্তিই আমি বা আপনি। এই আত্মশক্তির বশীভূত হইয়া যদি আত্মারামে লাগিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলেই স্বাধীন নচেৎ আমি পরাধীন। আত্মা ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে রত থাকার নাম পরাধীনতা। আসক্তির সহিত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে রত হইলেই ব্যভিচার হইবে, ব্যভিচার হইলে নিশ্চয়ই পতন হইবে। যিনি ইন্দ্রিয়ে রত না থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মাতে থাকেন, তাঁহাকেই প্রকৃত স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যিনি আত্মভাবে থাকিয়া সর্ব্বত্র সমানভাবে বিচরণ করেন তিনিই যথার্থ স্বাধীন পদবাচ্য। তাহা কৈ? তাহা ত আমার নাই। তবে আমি স্বাধীন কিসে? কেবল কথার স্বাধীন, কাজের নয়। আমি ত ঐরূপ স্বাধীন হইয়াই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছি। সংযমী পুরুষ ব্যতীত পুরুষমাত্রেই স্ত্রীজাতির শত্রু এবং সংযমশালিনী স্ত্রী ব্যতীত স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির শত্রু অর্থাৎ সাধারণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরস্পর পরস্পরের শত্রু। স্ত্রীও যেমন পুরুষকে মোহিত করিতে পারে পুরুষও তদ্রূপ নানা প্রকার প্রলোভনে স্ত্রীজাতিকে মোহিত করিতে পারে। একারণ স্বামি ব্যতীত স্ত্রীজাতির পরপুরুষের মুখাবলোকন করা উচিত নয়। পরপুরুষ মাত্রকেই পুত্র বা পিতৃবৎ জ্ঞান করা উচিত এবং পুরুষেরও নিজ স্ত্রী ব্যতীত পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করা কর্ত্তব্য নয়, পরস্ত্রী মাত্রকেই জননীর ন্যায় জ্ঞান করা উচিত। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ যে কাম আমাতে আছে সেই কাম স্ত্রীতেও আছে। সেই কামকে আমি কিংবা স্ত্রী উভয়ের কেহই জয়

করিতে পারি নাই। সুতরাং সেই কাম অবসর পাইলেই আমার উপর জোর করিবে। কামের উদয় হইলে তাহার বেগকে কে নিবারণ করিতে পারে? যিনি কামকে জয় করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অপরের সাধ্য নাই। ইচ্ছার নাশ না হইলে কামজয় হইবে না। বিনা সাধনে ইচ্ছার নাশ হইতে পারে না। সাধনের অভাবে ইচ্ছা বলবতী রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়-সংযমও হয় নাই। এমন অবস্থায় স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে যাওয়া আমার বাতুলতা মাত্র। তবে অনেক সময় অনেক কারণে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে না বটে, কিন্তু মনে মনে সকল কার্য্যই হইয়া যায়। মনের ধর্ম্মই এই যে, সে সর্ব্বদা নূতন নূতন কর্ম্ম ও নূতন নূতন সুখ অনুসন্ধান করিতেছে, কথনই এক বিষয়ে স্থির থাকে না। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। এমত অবস্থায় যদি আমাদের কোনরূপ সামাজিক বন্ধন না থাকে তাহা হইলে কে আমাদিগকে কুকার্য্য হইতে আটকাইয়া রাখিবে? ধর্ম্মভয় যদিও না থাকে লোকলজ্জার ভয়েও অনেকে অনেক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন। একারণ সামাজিক ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা কোনক্রমেই উচিত নয়। মনে করুন, লোকে গরুর গলায় বা শিঙে দড়ি বাঁধে কেন? দড়ি বাঁধিবার উদ্দেশ্য এই যে, সে কাহারও অনিষ্ট না করে। বন্ধন না থাকিলে যে গুলা ষাঁড় সে গুলা লোককে গুঁতাইয়া মারিবে, অথবা গাভীর প্রতি অযথা আক্রমণ করিবে এবং লোকেরও সর্ব্বনাশ করিবে। একারণ ষাঁড়কে এবং গাভীকেও বন্ধন করিয়া রাখিতে হয়, কেন না গাভীর দ্বারাও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। পরের

বাগানের গাছ পালা খাইবে এবং চরিতে চরিতে যদি ভুলক্রমে ষাঁড়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ষাঁড়কেও খেপাইয়া তুলিবে এবং ষাঁড়ও গাভী দর্শন করিয়া বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিবে ও অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া নিজের ও অপরের অনিষ্ট করিবে। সুতরাং বন্ধন যাহাতে দৃঢ় থাকে, তাহার চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকেন। মনে করুন, আমি যখন ষাঁড়বিশেষ, কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই এবং আমার গৃহিণীও গাভীবিশেষ তাহারও কোন জ্ঞান নাই, চঞ্চল প্রকৃতি, নিজের ইষ্টানিষ্ট বুঝেনা, তখন আমাদের সামাজিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? কেহ যদি ঘাসের সহিত বিষ মাখাইয়া দেয়, লোভের বশীভূত হইয়া গাভী যেমন তৎক্ষণাৎ সেই ঘাস ভক্ষণ করিয়া পরে বিষের জ্বালায় শেষে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে, তদ্রূপ আমিও যদি অজ্ঞানে বিষমিশ্রিত তৃণবৎ ভোগ-লালসা চরিতার্থ করি তাহা হইলে আমাকেও সেই রূপে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে হইবে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় গাভীরূপা স্ত্রীকে বা বৃষরূপী আমাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় কি না? এস্থলে, বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বলিবেন বন্ধনাবস্থাই আবশ্যক। কারণ পশুভাবাপন্ন জীবকে স্বাধীনতা দিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের আশা কখনই করা যাইতে পারে না। অপাত্রে স্বাধীনতারূপ রত্ন দান করিলে সে রত্নের গৌরব আর থাকিবে না। স্বাধীনতার দ্বারা অনিষ্ট হইতে দেখিলে ভবিষ্যতে আর কেহ স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করিবে না এবং ক্রমে 'স্বাধীনতা' এই শব্দেরও লোপ হইয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! তবে

কি এরূপ অবস্থায় আমরা স্বাধীনতারূপ রত্নমুকুট মস্তকে ধারণ করিতে পারিব না? পারিব, কিন্তু পশুভাব থাকিতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে না। যখন পশুভাব গিয়া দেবভাবের উদয় হইবে তখনই যথার্থ স্বাধীনতা লাভ হইবে। মনে করুন, এককালে এই বিশাল ভারতরাজ্য ব্রাহ্মণের ছিল। [উপস্থিত কালের ব্রাহ্মণ নয়, কারণ উপস্থিত কালের অধিকাংশই ব্রহ্ম-বন্ধু বা পতিত ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রাহ্মণের কথা আমি বলিতেছি না, ইঁহাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তবে যাহা কিছু আছে তাহা মৌখিক। কার্য্যে কিছুই নাই কেবল বচন সার। পাঠক যদি ব্রাহ্মণ হন তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বাবস্থা এবং উপস্থিত অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলেই আমরা পতিত হইয়াছি কি না বুঝিতে পারিবেন।] তাঁহারা এই বিশাল রাজ্যের ভার ক্ষত্রিয়দিগকে দিয়া স্বাধীনতা বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পার্থিব সুখকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া যোগপথ অবলম্বন দ্বারা আত্মজ্ঞান বা স্বাধীনতা রূপ রত্নমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন সেই স্বাধীনতারূপ রত্ন-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সে অবস্থায় সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গ এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের এলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতি রাজগণ তাঁহাদের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেন। উপস্থিত কালে আর তাহা দেখা যায় না, যাহা কিছু দেখা যায় সব বিপরীত। মুখে আমাদের আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথার অভাব নাই, কিন্তু কার্য্যে পশুভাবের পরিচয়। এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় পশুভাবাপন্ন জীবের স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে যাওয়া কেবল ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য মাত্র। ইন্দ্রিয়-

পরিতৃপ্তির জন্য জননীরূপা স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হয় নাই। যেমন বৃক্ষের পুষ্প জগতের শোভার জন্য বা পুষ্পের ঘ্রাণ লইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তদ্রূপ জননীরূপা নারী-জাতির সৃষ্টি শোভার জন্য বা ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য হয় নাই। যাঁহারা জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য পুষ্প আহরণ করেন না। তাঁহারা পুষ্প দেখিলেই পুষ্পের রূপে বা সৌরভে মুগ্ধ না হইয়া সেই পুষ্পের সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া পুষ্পের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং দেখেন যে, তাহার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির জন্য বীজকোষ বিস্তার পূর্ব্বক বীজধারণের জন্য পুষ্পরূপে বা মাতৃরূপে বিরাজমান। পুষ্প যেমন ফল উৎপাদনের জন্য দণ্ডায়মান, জননীরূপা নারীজাতিও তদ্রূপ। যদি বলি কেবল সৃষ্টির অভিপ্রায়েই কি ভগবানের নারীরূপে আবির্ভাব? আর কিছু কি অভিপ্রায় নাই? আর এক মহৎ অভিপ্রায় আছে, তাহা মুক্তিলাভের সাহায্যের জন্য। যদি বলি মুক্তিলাভের জন্য স্ত্রীজাতি কি সাহায্য করিবে? বরং ইহাইত শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীজাতি মুক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ এবং অনেক সাধুরাও এই বাক্য সমর্থন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাধুবেশধারী কতিপয় অজ্ঞানী লোকে এইরূপ অসার বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা অযৌক্তিক (যুক্তি বিরুদ্ধ)। তাহাতে কেবল ভগবানে দোষারোপ করা হয় মাত্র। ইহাতে মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, যদি স্ত্রীজাতি মুক্তিপথের কণ্টক-স্বরূপ হয়, আর সেই মুক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ, হয় তবে সেই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হয় কেন? বা ভগবান্ স্ত্রীরূপ ধারণ করেন কেন? তাহা হইলে ত ভগবান্ আমাদিগকে বঞ্চনা

করিবার জন্য স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন বা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছেন! যদি বলি, না, তিনি বঞ্চনার জন্য সৃষ্টি করেন নাই বা স্ত্রীরূপ ধারণ করেন নাই, আমরা লোভের বশীভূত হইয়া নিজে বঞ্চিত হইতেছি, তাহাতেও মীমাংসা হইল না। কেন না, যদি লোভের জিনিষ না থাকিত, তাহা হইলে ত আর আমার লোভ হইত না? যখন লোভের জিনিষ রহিয়াছে, তখন লোভ কেন না হইবে? যখন লোভ রহিয়াছে এবং জিনিষও রহিয়াছে, তখন কার্য্য কেন না হইবে? তবে যে সময়ে সময়ে কার্য্যের অভাব হয় তাহা কেবল রাজভয়ে এবং লোকলজ্জা ভয়ে। নচেৎ মনে মনে সকল কার্য্যই হইয়া যায় ও মনের অশান্তিরও অভাব হয় না। এমত অবস্থায় দোষী কে? যদি আমি কপট ভক্ত হই অর্থাৎ লোককে জানাই যে, আমি ভক্ত তাহা হইলে মুখে বলিব আমিই দোষী; কিন্তু ইহা আমার অন্তরের কথা নয়, কারণ পাছে লোকে আমাকে অভক্ত ভগবৎদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করে এই ভয়ে আমি বলি আমি দোষী; কিন্তু বাস্তবিক যদি স্ত্রীজাতি মাত্রেই মুক্তিপথের কণ্টক হয় তাহা হইলে আমি কখনই দোষী হইতে পারি না। কারণ তিনি কি জানিতেন না যে, ইহা কণ্টকে পরিণত হইবে? যদি বলি জানিতেন না, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাতে দোষ পড়ে, আর যদি বলি জানেন, তাহা হইলে এ বানর নাচাইয়া তাঁহার লাভ কি? বস্তুতঃ জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে আমিও দোষী নহি, তিনিও দোষী নহেন। কেন না স্ত্রী-দেহেও তিনি আছেন পুংদেহেও তিনি আছেন, দেহ কিন্তু তিনি নহেন। এমত অবস্থায় স্ত্রীজাতি মুক্তিপথের কণ্টক কখনই হইতে পারে না। তবে স্ত্রীজাতির প্রতি পশুভাবের

আসক্তিই কণ্টকস্বরূপ ও মুক্তিমার্গের প্রতিবন্ধক। উপস্থিত কালে শিক্ষার দোষে কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েই কামাসক্ত, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের কণ্টকস্বরূপ। নচেৎ পুরুষ যদি যথার্থ ধার্ম্মিক হন এবং স্ত্রী যদি যথার্থ ধর্ম্মপত্নী হন, তাহা হইলে মুক্তিমার্গের পথ অতি নিকট হয়, কারণ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। পক্ষী যেমন উভয় পক্ষের সাহায্যে অনায়াসে শূন্যমার্গে বিচরণ করে এবং উভয় পক্ষের একটী কাটিয়া দিলে তাহার উড়িবার ব্যাঘাত হয়, তেমনি স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে শূন্য স্বরূপ ব্রহ্মে বিচরণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। নতুবা মধ্যে মধ্যে পতিত হইতে হয় অর্থাৎ সাধকের সাধনাবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থায় যদি ধর্ম্মপত্নী সঙ্গে থাকে তাহা হইলে কামদেবের শর হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, নচেৎ উপায় নাই, পতন নিশ্চয়। সুতরাং স্ত্রীজাতি মুক্তিপথের প্রধান সাহায্যকারী। ঋষিরাও বলিয়াছেন,—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ধর্ম্মপত্নীই ধর্ম্ম-সাধনের সহায় অতএব স্ত্রীর সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে। এমন স্ত্রীজাতিকে বিনা শিক্ষায় স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতা প্রদান করা কোনমতেই উচিত নয়। তাঁহারা যখন নিজপতির সহিত সাধনের দ্বারা আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবেন তখন আপনা আপনিই স্বাধীন হইবেন, কাহাকেও বলিতে হইবে না। তখন স্বচ্ছন্দ মনে জগতে যথা তথা বিচরণ করিতে পারিবেন। তখন আর কাহারও দ্বারা কাহারও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। তখন প্রস্তর তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইবে; কারণ তখন তিনি

কঠিন প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিনতর এবং পুষ্প তাঁহাকে দেখিয়া অভিমানশূন্য হইবে, কারণ, পুষ্প জানে যে পুষ্পের মত আর কিছুই কোমল নাই, কিন্তু তিনি সুকোমল পুষ্প অপেক্ষাও কোমলতর। তিনি কামাতুর পশুভাবাপন্ন জীবের কাছে মহাশক্তি উগ্রচণ্ডা আবার দেবভাবাপন্ন জীবের কাছে মা অন্নপূর্ণা বা নারায়ণের লক্ষ্মী। এমত অবস্থায় তিনি সদা আপনাতে আপনি থাকিয়া স্বতঃই স্বাধীনভাবাপন্ন। সুতরাং স্বাধীনতা আবার দিবে কে? স্বাধীনতা সাধনার দ্বারা নিজে লাভ করিতে হয়, তাহা দিতে হয় না। এইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা যাহাতে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়, তাহারই যত্ন প্রাণপণে করা উচিত এবং তদনুরূপ শিক্ষা বা উপদেশ নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা স্ত্রীগণের পক্ষে আবশ্যক তাহা জানা উচিত ও আমরা কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকি এবং নূতন শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কি না তাহাও জানা বিধেয়। যদি বলি আজকাল বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাই যথেষ্ট, কারণ, বালিকারা বাঙ্গালায় ছাত্রবৃত্তি, ইংরাজীতে এণ্ট্র্যান্স্, এলে, বিএ, এমে, পাশ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আজ কাল বালিকারা যে যথেষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অগ্রে দেখা যাউক্ উক্তরূপ উচ্চ শিক্ষায় আমরা নিজে কি শিক্ষালাভ করিয়াছি? উক্তরূপ শিক্ষায় আর্থিক উন্নতি কতকটা হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু মানসিক উন্নতি ও মনের শান্তি কিছুই হয় না, বরং ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবল হইয়া আমাদিগকে বিলাসিতার চরম সীমায় আনয়ন করে। শিক্ষা-

লাভ করিয়া একটী প্রকৃত স্বার্থপর হইয়াছি। নিজের সুখের জন্য সদাই ব্যাকুল, দেশের লোকের প্রতি দয়া নাই। আমার পয়সা হইলেই হইল, তুমি মর আর বাঁচ তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানি না; তবে লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য, একটা না একটা সমাজ-ভুক্ত আছি মাত্র। বস্তুতঃ আমি ইন্দ্রিয়ের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া যদি আমায় ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে হইল, তাহা হইলে আর আমার কি শিক্ষা হইয়াছে? যদি এরূপ বিদ্যাশিক্ষায় আমার নিজের কিছুই লাভ হইল না, তবে সরলমতি বালিকাগণকে তাহা কিরূপে অধ্যয়ন করান যাইতে পারে? সুতরাং উক্তরূপ বিদ্যা আমাদের দেশের উপযোগী নয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা কাহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিবেন? পুরুষের নিকট হইতে বয়স্থা স্ত্রীলোকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়া কুশিক্ষাও প্রাপ্ত হইতে পারেন, কারণ, উভয়ের মধ্যে কেহই সংযমী নহেন বরং উভয়েই ইন্দ্রিয়ের দাস। এরূপ স্থলে কিছুই অসম্ভব নয়, সবই সম্ভব। যদি বলি পাশ্চাত্য বিদ্যায় না হয় দোষ হইল, আমাদের দেশীয় ভাষা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা, তাহাতে আর কি দোষ হইতে পারে? তাহাতেও দোষ আছে। পাশ্চাত্য বিদ্যাতেও যে আশঙ্কা, ইহাতেও তাহাই। কারণ, ইহাই বা কাহার নিকট শিক্ষা করিবে? যাঁহাদের নিকট সংস্কৃত বা বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে হইবে তাঁহারাও ত সংযমী নহেন। সুতরাং ইহাতেও ব্যভিচারের আশঙ্কা আছে। ইহাও স্ত্রীলোকের উপযুক্ত শিক্ষা নয়। এক্ষণে দেখা যাউক্ স্ত্রীলোক-দিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং সে শিক্ষাই

যা কি ও কাহার নিকট হইতেই বা ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিবে? প্রথমতঃ আমাদের দেশে বালিকাদিগকে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কোন শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। বালিকারা কেবলমাত্র পিতামাতার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া চলিবে। পিতামাতারও বালকবালিকাগণের সম্মুখে কোন অন্যায় কার্য্য বা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ, বিবাহের পূর্ব্বপর্য্যন্ত পিতামাতাই বালিকাগণের শিক্ষাপুস্তক। বালকবালিকাগণ পিতামাতার কোন রূপ কদাচার দেখিলে তাহা আর কোন কালে বিস্মৃত হইবে না। একারণ পিতামাতার এরূপ সতর্কভাবে চলা উচিত যাহাতে বালকবালিকাগণের কুশিক্ষা না হয়। উপস্থিত কালে তাহা অতি বিরল। পিতামাতার শিক্ষা নাই, বালকবালিকা শিক্ষিত হইবে কিরূপে? উপস্থিত কালে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, বালকবালিকারা পিতামাতার অবাধ্য হয়, পিতামাতাকে ভক্তি করে না, অথবা গালি দেয়, কটুকাটব্য বলে। ইহা কেবল পিতামাতার দোষেই হইয়া থাকে, বালকবালিকার দোষে নহে। আমি আমার পিতামাতাকে যে ভাবে দেখিব, আমার বালকবালিকাগণও আমায় ঠিক সেই ভাবে দেখিবে। আমি যদি আমার পিতামাতাকে দেবভাবে দেখিতাম, তাহা হইলে আমার সন্তানেরাও আমাকে দেবভাবে দেখিত। আমি যদি পিতামাতাকে দাস দাসী ভাবে দেখিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকেও তাহারা দাস ভাবে দেখিবে—তাহাদের নিকট আমার দেবভাবের আশা করা বৃথা। আশা করিলেও চলিবে না; কারণ বাল্যকালে তাহারা

আমার কার্য্য দেখিয়া যেরূপ শিখিয়াছে, এখন আর কোন শিক্ষাতে তাহাদের সে সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবে না, যেহেতু তাহা বাল্যকালের সংস্কার হৃদয়ের অস্থিতে অস্থিতে এমন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর উঠিবার নয়। তাড়না বা উপস্থিত কালের শিক্ষায় তাহা যাইবার নহে। একারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পিতামাতার বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক, কারণ পিতামাতাই বালকবালিকাগণের পুস্তকস্বরূপ। পূর্ব্বকালে বালকগণ ৫ম বর্ষ পর্য্যন্ত পিতামাতার কার্য্য দেখিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। পরে গুরুগৃহে যাইয়া গুরুর নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইত; সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া দারপরিগ্রহ করিত; অনন্তর সন্তান উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইত। এক্ষণে দেখা যাউক বালকগণ গুরুগৃহে যাইয়া যে বিদ্যাশিক্ষা করিত সে বিদ্যাই বা কি। বিদ্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান আবার কোন্ বিষয়ক জ্ঞান তাহা জানা উচিত। জ্ঞান দুই প্রকার—১ম আত্মবিষয়ক, ২য় ইন্দ্রিয়বিষয়ক। ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞানকেই অবিদ্যা বোধে ত্যাগ করা উচিত। আত্মবিষয়ক জ্ঞান বা অধ্যাত্মবিদ্যাই মনুষ্যমাত্রেরই শিক্ষণীয়, কারণ এই অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রভাবে মনুষ্যের কোন নীতিই জানিতে বাকী থাকে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সকল নীতিই অধ্যাত্ম-বিদ্যার অধীন। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ হইলে আর অন্ধকার থাকে না, তদ্রূপ আত্মপ্রকাশে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদয়ে আর হৃদয়ে অন্ধকার থাকে না। একারণ আত্মবিদ্যাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা। উক্তরূপ আত্মবিদ্যা পুঁথি বা পুস্তক পড়িলে

হইবে না। কোন পুস্তকে চিনির গুণ বর্ণিত থাকিলে তৎ-পাঠে যেমন চিনির মিষ্টতা বোধ হয় না, এবং চিনির আস্বাদন পাইতে হইলে যেমন চিনি খাইতে হয়, তেমনি পুস্তক বা পুঁথিতে চিনিস্বরূপ ব্রহ্মের গুণপাঠ করিয়া তৃপ্তিরূপ রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না, তৃপ্তিরূপ শান্তি হইতে দূরে থাকিতে হয়। একারণ, পূর্ব্বে বালকদিগকে গুরুগৃহে পাঠান হইত। তথায় বালকগণ গুরূপদেশে কার্য্য করিয়া এবং গুরুজনের কার্য্য দেখিয়া শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষা সংস্কারগত না হইলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। নিজে কর্ম্ম না করিলে সংস্কার হয় না এবং কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা যায় না। কেবল কথায় জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা লাভ হয় না। জ্ঞান কার্য্যের দ্বারা না হইলে তৃপ্তিরূপ শান্তিলাভ হয় না। ভোজন না করিয়া কেবল ভোজন ভোজন এই শব্দ করিলে যেমন ভোজনের তৃপ্তি হয় না বা পেট ভরে না, বরং কেবল বকিয়া মুখ তিক্ত হইয়া ক্লেশকর হয়, তদ্রূপ বিনা কর্ম্মে কখন শিক্ষার সম্পূর্ণতা লাভ হয় না। উপস্থিত কালের শিক্ষায় শান্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শান্তি হইবে কোথা হইতে? যাহার মূল কুশিক্ষা, যাহা বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হওয়ায় সংস্কারগত হইয়াছে, তাহা কি আর কেবল কথায় দূর হইতে পারে? কথায় দূর হইবে কোথা হইতে? যাঁহারা কথায় উপদেশ দিতেছেন, তাঁহা-দের নিজের আচার ব্যবহার ও কার্য্য দেখিয়া তাঁহাদের কথায় আর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকে না; সুতরাং কুকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। পিতামাতার উপর বালকবালিকাগণের যত বিশ্বাস এত আর কাহারও উপর হইতে পারে না। তাহারা

বিদ্যালয়ে যে সকল বাক্য শ্রবণ করে, বাটীতে পিতামাতার নিকট তাহার বিপরীত দেখে। সুতরাং তাহারা যাহা শ্রবণ করে কার্য্যে তাহা দেখিতে পায় না। এই জন্য কোন শিক্ষাই হয় না—হইতেছেও না। কালমাহাত্ম্যে পূর্ব্বপ্রথা রহিত হইয়া এখন সব কুশিক্ষায় পরিণত হইতেছে। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে জ্ঞান লাভ হইতেছে না এবং শিক্ষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। শিক্ষার অসম্পূর্ণ অবস্থায় ব্যভিচারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আজ কাল তাহারও অভাব নাই, চতুর্দ্দিকেই অশান্তি বিরাজ করিতেছে। ইহা কেবল শিক্ষার দোষে। স্বদেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহার পরিত্যাগেই এই বিষময় ফল ফলিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যাঁহাদের অনুকরণ করিয়া থাকি, তাঁহারা ত স্বদেশের রীতি নীতি পরিত্যাগ করেন না। ইহাতেই জানা যায় যে স্বদেশের প্রতি আমাদের কত অনুরাগ আছে! বস্তুতঃ আমরা যতদিন পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের কার্য্যের অনুসরণ না করিব ততদিন আমাদের কোন শিক্ষাতেই মঙ্গল হইবে না। স্ত্রীশিক্ষার অনুরোধে বালকগণের শিক্ষার কথা উপস্থিত করা গেল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বালিকাগণ বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতার কার্য্য দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবে। বালিকা নিজ মাতার নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় যাবদীয় কর্ম্ম শিক্ষা করিবে। শরীর পালন, শিশুপালন, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহ, এবং দয়া, সরলতা, স্থিরতা, মিষ্টভাষিতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অকপটতা, সন্তুষ্টতা, পরদুঃখে কাতরতা, মিতব্যয়িতা, অতিথিসেবা, দেবসেবা এই সকল কার্য্য বালিকারা মাতার নিকট প্রত্যক্ষ

দর্শন করিয়া অভ্যাস করিতেন। পরে উপযুক্ত কালে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পিত হইতেন। পাত্রও এখনকার মতন ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন না। কারণ, যিনি পাত্র তিনি কখন অপাত্র হইতে পারেন না। দুঃখের বিষয় আজকাল সেরূপ পাত্র মেলা কঠিন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বালকেরা গুরুগৃহে থাকিয়া যখন আত্মবিদ্যাবলে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইতেন, তখন গুরুর অনুমতি-ক্রমে গৃহে আসিয়া দারপরিগ্রহ করিতেন। পূর্ব্বে উক্তরূপ পাত্রের হস্তেই কন্যা অর্পিত হইত। হিন্দুর বিবাহ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য নয়। হিন্দুরা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকেন। স্ত্রীর সহিত একত্র ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয় বলিয়া, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বালিকা পিতামাতার কার্য্য দেখিয়া যাহা যাহা অভ্যাস করিয়াছেন, স্বামিগৃহে আসিয়া পূর্ব্বে পিতাকে যেরূপ ভাবে দেখিতেন, এক্ষণে সেই ভাবে স্বামীর পিতা অর্থাৎ শ্বশুরকে দেখিতে লাগিলেন, এবং মার প্রতি যেরূপ ভাব ছিল এক্ষণে শাশুড়ির প্রতি সেই ভাব প্রযুক্ত হইল। মা যেরূপ ভাবে নিজ স্বামীকে দেখিতেন কন্যাও নিজ পতিকে সেই ভাবে দেখিতে লাগিলেন এবং মার যে সকল গুণ ছিল তাহা পূর্ব্বে অভ্যস্ত হইয়াছিল মাত্র এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। স্বামী নিজে স্বাধীনচেতা, স্ত্রীও স্বাধীন চিত্ত লাভ করিবার জন্য স্বামীর নিকট আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ শিক্ষা স্বামীর নিকট যত সহজে হইতে পারে এমন আর কুত্রাপি হয় না। তবে স্বামীর অভাবে কোন সংযমী পুরুষের নিকটেও হইতে পারে। কারণ, সংযমী পুরুষের নিকট কাহারও কোন আশঙ্কা নাই।

বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির স্বামী ব্যতীত অন্যের নিকট শিক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যভিচারের সম্ভাবনা। পরাবিদ্যা ব্যতীত অপরাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া লাভ কি? মনে করুন, আমি অঙ্কবিদ্যায় এমে, পাশ করিয়াছি, ইহাতে কি আমার মনের শান্তি হয়? যদি কোন আফিসে কাজ করি তাহা হইলে তেরিজ জমাথরচ ছাড়া আমার আর কিছুরই দরকার হয় না। ৩৲ টাকা মণ চাউল হইলে /৮০ চাউলের দাম হিসাব করিতে হয়ত দুই দিস্তা কাগজ নষ্ট করিলাম তথাচ ঠিক হইল না। এইত আমার বিদ্যা। যদি বলি আমি বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখিয়াছি। তাহাতেই বা আমার প্রয়োজন কি? উহাই বা আমার কি কাজে আসিবে? যতদিন কলেজে তত দিন, তাহার পর আর নাই, সেই ৪০।৫০৲ টাকার চাকরী। যদি বলি আমি ইংলিশে এমে, তাহা হইলেই বা আমার কি হইল? হয়ত ইংরাজীতে একখানা চিঠি লিখিতে গা ঘামিয়া যায়, দুটা ইংরাজী বলিতে হইলে বাটীতে বসিয়া বলিলে মুখে যেন পুষ্পবৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু কোন ইংরাজের নিকট বলিতে গেলে মুখে আর কথা সরে না, তখন আমি তোত্‌লা হইয়া যাই। না হয় স্বীকার করিলাম ইংরাজী শিক্ষা হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন ইংরাজ বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালাভাষায় পণ্ডিত হন, তথাপি তিনি "পটল তোলার" অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না। তদ্রূপ আমি চলিত ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইব না। তবে যদি ২০।২৫ বৎসর বিলাতে বাস করি তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, নচেৎ নহে। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, ইংরাজী রাজভাষা, সুতরাং ইহা জানা উচিত। কারণ, রাজা পিতামাতা স্বরূপ, রাজভাষা জানা না থাকিলে আমরা

নিজের কষ্টের বিষয় এবং আমাদের মনের ভাব তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে পারিব না। সুতরাং বালকদিগেরও রাজ-ভাষা জানা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আত্মধর্ম্ম ও আত্মনীতি বিসর্জ্জন দিয়া অপরা বিদ্যা লইয়াই মজিয়া থাকিতে হইবে তাহা নিতান্ত অনুচিত। আমাদের না হয় কার্য্যের অনুরোধে মজিতে হইয়াছে। তাই বলিয়া স্ত্রীদিগকে মজাই কেন? যে দেশে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি স্ত্রীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ কিনা সেই দেশের স্ত্রী-লোকেরা শিক্ষার গুণে ধাত্রীরূপে বিরাজিতা হইতেছেন। হায়! হায়! আমরা কি ভ্রমেই পড়িতেছি। আমরা যাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে যাইতেছি, তাঁহারা ত স্বদেশীয় আচার ও নীতি ত্যাগ করেন না। সকল দেশের দেশাচার সমান হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নয়। সকল দেশের জল বায়ুর গুণ যখন সমান হয় না, পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়, তখন দেশাচার কেমন করিয়া সমান হইবে? আমাদের দেশের আচার ব্যবহার আমাদের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, অপর দেশের লোকের আচার ব্যবহার ও নীতি আমাদের পক্ষে তেমনি অনুপযোগী। তবে হয় ত যৌবনে মত্ত হইয়া দুদিনের জন্য অপরের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না; সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যায় অর্থাৎ বেশী বয়স হইলে আর সে ভাব থাকে না। তখন বাল্যকালের যে সংস্কার, তাহাই মনে উদয় হয়, এবং ঐ সংস্কার পরিত্যাগ হেতু সর্ব্বদা অনুতাপ করিতে হয়। মনের অনুতাপ থাকিতে শান্তি স্থাপন হয় না। সুতরাং সর্ব্বদাই অশান্তি। এরূপ অশান্তিকর শিক্ষালাভে অনিষ্ট

ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা কোথায়? যে বিদ্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম বা মনের শান্তি হয় না, তদ্দ্বারা কেবল ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত করা হয় মাত্র। তবে অর্থাগমের অনুরোধে যাঁহারা অপরা বিদ্যার অভ্যাস করিতেছেন, করুন, কিন্তু তাই বলিয়াই যে আত্মধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে তাহারও কোন কারণ নাই। স্ত্রীজাতিকে যে অর্থাগমের জন্য অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। স্ত্রীজাতির দ্বারা অর্থাগমের প্রত্যাশা করা নিতান্ত নীচ অন্তঃকরণের পরিচয় দেওয়া মাত্র। উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে আমি ত দাসত্বরূপ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি। আমার সহিত জননীরূপা নারী-জাতিকে দাসীরূপে নিযুক্ত করি কেন? জননী, স্ত্রী বা ভগিনী দাসী হইলে পুত্রের স্বামীর বা ভ্রাতার পক্ষে ইহা আনন্দের বিষয় না হইয়া বরং অনুতাপেরই বিষয় হওয়া উচিত। হায়! আজ কালের কি বিচিত্র লীলা! ভাল বিষয় মন্দ বলিয়া, আর মন্দ বিষয় ভাল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অরুচিকর বিষয় লইয়া আনন্দ করিতেছি আর রুচিকর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আস্ফালন করিতেছি। হায়! হায়! বর্ত্তমান শিক্ষার কি মহিমা! শিক্ষার গুণে কেমন উন্নতি লাভ করিয়াছি! একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা যাহাকে উন্নতি মনে করিতেছি তাহা বাস্তবিক আমাদের দেশের অবনতির সোপানস্বরূপ। কারণ, আত্মবিদ্যা (পরাবিদ্যা) ব্যতীত অবিদ্যার দ্বারা কখন উন্নতি লাভ হইতে পারে না। মনের উন্নত অবস্থা লাভ করাকেই প্রকৃত উন্নতি লাভ কহা যায়। আত্মবিদ্যা সাধনসাপেক্ষ, সাধন ব্যতীত আত্মবিদ্যা লাভ হয় না। কেবল আত্মা আত্মা করিলে অথবা

শাস্ত্রপাঠে তাহা হইবে না। সাধন বিনা উহা কিছুতেই হইবার নহে। সাধন গুরুসাপেক্ষ। গুরূপদেশে সাধনরূপ অভ্যাসের দ্বারা কালে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে মনের মলিনতা দূর হইয়া মন উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনের এই উন্নত অবস্থাই ব্রহ্মের রূপ। সুতরাং এ অবস্থায় কোন আশঙ্কা নাই। আশঙ্কা না হইবারই কথা। যাহাকে আশঙ্কা করিব সে আমার বশীভূত, আমি তাহার বশীভূত নহি। সুতরাং জগতে আমার আশঙ্কার স্থান বা বিষয় কোথাও নাই, শিক্ষা করিবারও কিছুই নাই, যেমন জানা হইলে জানিবার আবশ্যক থাকে না তদ্রূপ। যদি এরূপ বলা যায় যে এখন আমাদের চারিদিক অভাবে পরিপূর্ণ এত অভাব সত্ত্বে বালকবালিকাগণকে এই আত্মবিদ্যা কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? বাস্তবিক ইহা মনে হওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষণে দেখা যাউক অভাব মিটে কিসে এবং কি কার্য্য করিলেই বা অভাব যায়? প্রথমে দেখা যাউক কাহারও অভাব মিটিয়াছে কি না? বাস্তবিক দেখিতে গেলে অভাব যে কাহারও মিটিয়াছে তাহা ত বোধ হয় না; কারণ যতকাল জীবের ভোগ লালসা বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল অভাবেরও নাশ হইবে না। গরিব প্রজা হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই অভাব বর্ত্তমান আছে। তবে আমরা সময়ে সময়ে পরস্পর পরস্পরকে মনে করিয়া থাকি যে আমা অপেক্ষা অপরের অভাব কম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা আমার ভ্রম। আমার অভাব শব্দের অর্থবোধ না থাকায় আমি মনে করিয়া থাকি যে আমা অপেক্ষা অপরের অভাব কম। বস্তুতঃ সকলেরই হৃদয়ে অভাব বিরাজ করি-তেছে ও কষ্ট দিতেছে। সেই অভাব দূর হইলে জীবের কষ্ট

দূর হইবে। ইচ্ছা থাকিতে অভাব দূর হইবে না। ইচ্ছার নাশে অভাবের নাশ—ইচ্ছা সত্ত্বে অভাবের নাশ নাই। এক্ষণে ইচ্ছার নাশ হয় কিসে তাহাই দেখা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক ইচ্ছার উৎপত্তি কোথায়? ইচ্ছার আর একটী নাম রতি। মন ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হইলেই ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। যদি এরূপ বলা যায় যে, মন ইন্দ্রিয়ে যায় কেন, এবং মনই বা কোথা হইতে হইতেছে ও মনের উৎপত্তিই বা কোথায়? এই মনের উৎপত্তি প্রাণ হইতে অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলতায় যে অবস্থা হয়, তাহাই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন। প্রাণ স্থির হইলে মনঃস্থির হয়, সেই স্থির মনই আত্মা। আত্মাই চঞ্চল ভাবাপন্ন হইয়া সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন উপাধি ধারণ করায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়ায় ইচ্ছার উৎপত্তি হইতেছে। এই ইচ্ছার সত্ত্বা থাকিতে অভাবের নাশ কিরূপে হইবে? অভাব দূর করিতে হইলে যেখান হইতে উহার উৎ-পত্তি হইয়াছে পুনরায় সেখানে গেলে অর্থাৎ প্রাণে লক্ষ্য রাখিলে অভাবের নিবৃত্তি হইতে পারে—নচেৎ নহে। ভাবের উদয়ে অভাবের নাশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইচ্ছার নাশে অভাবের নাশ হইয়া থাকে, এক্ষণে দেখা যাউক,ইচ্ছার নাশ কখন হয়? না মরিলে ইচ্ছার নাশ হয় না। শবদেহে যেমন বায়ুর চঞ্চলতা থাকে না অর্থাৎ স্থিরভাব হয় তদ্রূপ জীবদ্দশায় দেহস্থিত বায়ুর বিনাবরোধে স্থিরত্ব সাধিত হইলে যে ভাব হয় সেই ভাবের উদয়েই ইচ্ছা ও অভাবের নাশ হয়। ইহা কর্ম্মযোগসাপেক্ষ। ভাব একটা অবস্থাবিশেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় চঞ্চলতা থাকে না। আত্মার সেই স্থিরাবস্থাকেই ভাব কহে। তাহাই

আত্মভাব। আমার মন যথন ইন্দ্রিয়ের আসক্তি ছাড়িয়া আত্মায় আসক্ত হইবে, তথনই অভাব দূর হইয়া ভাবের উদয় হইবে; সুতরাং অভাবও যাইবে। নচেৎ ধনাদির দ্বারা কিছুতেই অভাব যাইবে না। যদি নরনারীর অভাব দূর করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অপরাবিদ্যার দ্বারা কোন রূপেই অভাব দূর ও সমাজের প্রকৃত হিতসাধন হইবে না; বরং ব্যভিচারে দেশ উৎসন্ন যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।